OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 715 - 722
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লোকসাহিত্যে নারীর অন্তঃকথা

অন্বেষা দাস
প্রাক্তন ছাত্রী
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : anwesha92.das24@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Folklore, Women, Domestic, Creative, Express, Hope, Desire, Dignity.

Abstract
Folklore is a collage of the lived realities of ordinary people, providing valuable insights into the social position of women. In the earliest stages of human civilisation, women held a significant status in society. They actively participated alongside men in the struggle for survival and were industrious contributors. However, with the progression of civilisation, women's autonomy and societal roles began to diminish, while male dominance steadily increased. Over time, the belief took root that women were incapable of participating in physically demanding activities. Consequently, men consolidated their authority, relegating women to subordinate roles confined within the domestic sphere. This confinement created an intense yearning within women to express their unspoken anguish. Much of Bengali folklore, predominantly oral in nature, was composed by women. Their oral literature naturally reflects their lived experiences, encompassing their struggles, sorrows, unfulfilled desires, and aspirations. Through their inherent creativity, women have crafted fairy tales, composed ritualistic bratakatha, soothing lullabies, and folk songs tied to various customs. Regardless of the themes, these works invariably carry the imprint of women's personal experiences and inner reflections. Women's repressed hopes and dreams found fulfilment through the female characters in their tales, where the heroines, despite enduring hardship and oppression—often at the hands of co-wives in a patriarchal society—reclaimed their dignity and fortune by the story's end. Such narrative twists reveal the latent desires of women's hearts. Similarly, the ritualistic rhymes of women's vows (bratakatha) serve as reflections of their direct lived experiences. These verses express the hopes, aspirations, and contemplations of both unmarried and married women, capturing their achievements and disappointments. Across various branches of folklore, rural Bengali women have vividly and spontaneously articulated their life's struggles, emotional turmoil, and suppressed sighs with masterful skill. Over time, as patriarchal oppression intensified, women—confined within the domestic sphere—grew vengeful, became aware of their individuality, and began to recognise the language of their subjugation. This awareness

compelled them to portray their deprivations and grievances in the mirror of folklore, giving voice to their marginalised existence.

Discussion

লোকসাহিত্য লোকায়ত জীবনের কোলাজ। লোকজীবনের বিচিত্র বর্ণের প্রতিচ্ছবি লোকসাহিত্যে ধরা পড়েছে। লোকসাহিত্যের এই বিপুল সৃজনীর মধ্যে নারীর সামাজিক অবস্থান চিত্ররূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা জানি, আদিমযুগে বন্য জীবনযাপনে নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় ছিল। সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কম ছিল। সেই সময় মূলত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে শিকারের প্রয়োজনে জনসংখ্যার বৃদ্ধি একান্ত অভীষ্ট ছিল। একমাত্র নারীরাই সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম বলেই সেই সময় সমাজে নারীদের প্রাধান্য ছিল। শুধু তাই নয় নারীরা পুরুষদের সাথে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইতেও সামিল হত, তারাও যথেষ্ট কর্মঠ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমেই নারীজাতির ব্যক্তি স্বাধীনতা, তাদের অবস্থান সীমিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজন হতে থাকে শিকারের। আর শিকারের প্রয়োজনের সাথে সাথেই পুরুষের প্রাধান্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হতে থাকে যে নারীরা অধিক দৈহিক পরিশ্রমের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সমর্থ নয়। ফলে ক্রমেই সমাজে পুরুষেরা কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিচিতি নিস্পৃহ হতে থাকে। সমাজের গভীরে পুরুষতন্ত্রের শিকড় এমনভাবে প্রোথিত হয়, যার পরিণামে ধীরে ধীরে পুরুষতন্ত্রের মানসিকতায় একধরণের কর্তৃত্ব সুলভ অহংকার বিরাজ করতে থাকে। সেই দম্ভেই তারা নারীজাতিকে তাদের হাতের ক্রীড়নক বলে ভাবতে শুরু করে।

পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মতো ভারত তথা বাংলাতেও নারীরা কমবেশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় কোনঠাসা। নারীদের অবস্থান হতে থাকে গৃহের অভ্যন্তর। সেই অন্তঃপুরের পরিসরে নারীজাতির হৃদয়ের নানা টানাপোড়েনগুলি, দীর্ঘদিনের লালিত বঞ্চনাগুলি যেন প্রসববেদনা অনুভব করতে থাকে। হৃদয়-অন্তঃস্থলে সঞ্চিত হাহাকারগুলি প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। বাংলার লোকসাহিত্যের অধিকাংশই মৌখিক সাহিত্য এবং তার বেশিরভাগই মেয়েদের দ্বারা রচিত। তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-বেদনা, অপ্রাপ্তি, পরম প্রার্থিত বিষয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দ্বারা রচিত মৌখিক সাহিত্যে উঠে এসেছে। মেয়েরা তাদের অর্ন্তনিহিত সৃজনী প্রতিভায় রূপকথা সৃষ্টি করেছে, মুখে মুখে ব্রতকথা রচনা করেছে, ছেলেভুলানো ছড়া গেঁথেছে শব্দের পিঠে শব্দ জুড়ে কিংবা বিভিন্ন লোকাচারমূলক গান বেঁধেছে, যেমন— বিবাহের গান, প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত, হৃদয়-উত্তাপ উৎসারিত বিরহের গীত কিংবা নিছক বিনোদনমূলক সঙ্গীত। বিষয় যাই হোক না কেন, তাতে নারীজাতির ব্যক্তিমনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিজস্ব উপলব্ধি ভাষারূপ পেয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা পুষ্ট সত্যটি যখন একটি সৃজনী মন কর্তৃক রসসমৃদ্ধ হয়ে নিজের ভাষায় প্রকাশ পায় এবং সমাজে আর পাঁচজনের কাছে চিরন্তন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, তখন সেই বাক্যটি জনসমক্ষে গৃহীত হয়ে সাহিত্যের রূপ লাভ করে। এইভাবে উদ্ভাবিত হবার পর বাক্যগুলি শ্রুতি-পরম্পরায় সমাজের অন্তঃস্থলে অগ্রসর হয়, বিকাশিত হয় এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই মৌখিক সাহিত্যগুলি আস্বাদিত হতে থাকে।

লোকসাহিত্যের একটা বিশেষ পরিসর জুড়ে রয়েছে রূপকথার গল্পগুলি। মুখে মুখে প্রচলিত এই গল্পগুলির বেশিরভাগই আবর্তিত হয় নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে। নারীজাতির অন্তরের সুপ্ত অপূর্ণ ঈপ্সাগুলি রূপকথার গল্পের নারী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে যেন পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করে। নারীকেন্দ্রিক রূপকথার গল্পগুলিতে কখনো দেখা যায় যে মা তার সতিনদের কাছে নির্যাতিত হয় এবং গল্পের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় মা তার ভাগ্যগুণে সন্তানদের সাহায্যে তার হৃতসম্মান ফিরে পায়। পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন ছিল ফলে সতিন কর্তৃক নির্যাতন, লাঞ্ছনা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই পল্লীবাংলার লোকসমাজের মেয়েরা রূপকথার কল্পজগৎ রচনা করলেন, যাতে দেখালেন যে সতিনের সমস্ত বিরূপতা সত্ত্বেও তিনি গল্পের পরিশেষে তার হৃতসম্মান ও সৌভাগ্য ফিরে পেলেন— গল্পকথার এহেন মোচড় নারীর অন্তরের সুপ্ত বাসনারই পরিচায়ক। আবার নারীকেন্দ্রিক রূপকথার গল্পগুলির মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় যে ছোটরানী দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়। বাঙালি সমাজে একান্নবর্তী পরিবারে সাধারণত দেখা যায় যে শাশুড়ি, ননদ, কিংবা জায়েরা সংসারে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অধিক কর্তৃত্ব ফলাতে চায় এবং বাড়ির ছোটবউ সংসারে কোনঠাসাভাবে অবস্থান করে। উল্লিখিত রূপকথার কাহিনির বড়রানীরা মূলত বাস্তব জীবনের শাশুড়ি, জা, ননদ এদেরই প্রতিরূপ, কোথাও গিয়ে এদের দ্বারা গৃহের ছোটবউ-এর উপর শাসন, তত্ত্বাবধানমূলক মনোভাব, ঈর্ষা, বিরূপতা যেন রূপকথার গল্পের বড়রানীর ছোটরানীর ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতার সাথে মিলে মিশে গেছে। আবার কোনো কোনো রূপকথার গল্পের বুননে নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়টিও গেঁথে আছে।

এবার আসা যাক প্রবাদ-প্রসঙ্গে। নারীর দৃষ্টিতে তার পারিপার্শ্বিকতার যে চিত্র ধরা পড়ে, বা এমনভাবে বলা যায় যে, সমাজ নারীর ওপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, যেভাবে নারীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে তার অবস্থান চিহ্নিত করে দেয়, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব চিত্রই বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে নারী প্রবাদের মধ্যে তুলে ধরেছে। ফলে অনিবার্যভাবেই সমাজের কঠোর সত্য, চরম বাস্তবতা প্রবাদে উঠে এসেছে।

আমাদের দেশে আজও নারীর তুলনায় পুরুষের গুরুত্বকে সর্বপ্রথমে গ্রাহ্য করা হয় এবং পুরুষের শিক্ষাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যদিও বর্তমানে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেকটাই কমে এসেছে। মানসিকতার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে এবং শিক্ষাদীক্ষায় নারীরা এগিয়ে চলেছে পুরুষের পাশাপাশি। কিন্তু যে সমাজ পটভূমিকায় প্রবাদগুলি রচিত সেই সমাজের প্রাচীন মানসিকতার ছাপ প্রবাদগুলিতে স্পষ্ট। সেসময় সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য এতটাই প্রবল ছিল যে নারীশিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হত এবং নারীর অবস্থান চিহ্নিত করে দেওয়া হত হেঁশেলে—

"ছেলে শিখবে লেখাপড়া/ মেয়ে শিখুক রান্নারান্না।
মেয়ে যত পাশ দেবে/ মাথায় চড়ে তত বসবে।
'লেখাপড়া যে মেয়ে করে/ তাকে নিয়ে দুর্ভোগ সংসারে।"

সমাজ বাস্তবতার এক শোচনীয় রূপ উল্লিখিত প্রবাদগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমাজে লৈঙ্গিক বৈষম্য তো ছিলই এমনকি কন্যা সন্তানের জন্মও যে অনভিপ্রেত ছিল, তার প্রমাণও মেলে—

"পুত্র সব সম্পদ / কন্যা সব আপদ।
ছেলে হলো হীরের টুকরো / মেয়ে হলো খুদকুঁড়ো।
ছেলে বিয়োলে স্বর্গবাস / মেয়ে বিয়োলে নরকবাস।
মেয়ে হলে মুখ ঘোরায় / ছেলে হলে শাঁখ বাজায়।"[১]

দৃষ্টান্তগুলিতে যেভাবে পুরুষের প্রবল আবশ্যকতা এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা মূলত সমাজ মানসিকতার সংকীর্ণতাকেই তুলে ধরেছে। প্রবাদগুলির মধ্যে স্বাধীনচিন্তার অভাব সুস্পষ্ট। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাম্ভিকতাই এই প্রবাদগুলিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। সেকালের সামাজিক পটভূমিতে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর জন্মদাত্রী মায়ের যে কীরূপ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, এই প্রবাদগুলোই তার প্রামাণ।

লোকজ সাহিত্য যেহেতু সমাজজীবনের দর্পণ, তাই স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সমাজের নির্মম আচার-আচরণ, অন্ধ কুসংস্কারের চাপে পিষ্ট নারীর অসহায়তার এক জ্বলন্তচিত্র প্রবাদের মাধ্যমে প্রকট হয়ে উঠেছে—

"কার আগুনে কেবা পোড়ে আমি জাতে কলু
মা আমার কি পুণ্যবতী বলছে দে উলু।"[২]

প্রবাদটিতে সতীদাহের প্রসঙ্গ রয়েছে। আমরা জানি, সতীদাহ একটি হিন্দুধর্মীয় প্রথা যেখানে স্বামীর শবদাহের সঙ্গে তার বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দাহ করা হত। কিছু ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, কোনো নারীকে বলপূর্বক জোর করে তুলে এনে অন্যের স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হত। উল্লিখিত প্রবাদটিতে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জাতে কলু এমন এক গৃহবধূকে অন্যের স্বামীর চিতায় তোলা হলে সে তার জাত পরিচয় দিয়ে এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে চায় কেননা সতীদাহ প্রথা প্রাচীন যুগে শুধুমাত্র রাজপরিবারে বা অভিজাত সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল। কিন্তু

সেইস্থানে উপস্থিত সমাজের জনৈক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি সেই নারীকে ওই মৃত ব্যক্তির চিতায় সহমরণে বাধ্য করতে তাকে জানায় আগুনে ঝাঁপ দিলে সে পুণ্যবতী হবে এবং উলুধ্বনি তুলতে নির্দেশ দেয়। তৎকালীন সময়ে এইরূপ সম্পূর্ণ অমানবিক নির্মম প্রথার বলি হতো অসহায় স্ত্রীজাতি।

পণপ্রথা আমাদের সমাজে দীর্ঘকালের এক করাল অভিসম্পাত। এর মূলে রয়েছে সমাজের সংকীর্ণ মনোভাব। সকল পিতা-মাতারই প্রত্যাশা থাকে তাদের কন্যা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে। কিন্তু পাত্রপক্ষ যখন বিবাহের তাৎপর্যের তুলনায় যৌতুকের দাবিকে অধিক প্রাধান্য দেন, তখনই ঘটে বিপর্যয়। পাত্রপক্ষের বিপুল দাবিদাওয়া পূরণ করতে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা-মাতাকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়, এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর রয়েছে। সর্বোপরি সেই অসহায় কন্যার জীবনে নেমে আসে দুঃসহ যন্ত্রনা। প্রতিশ্রুতি মতো যৌতুক না মেলায় শ্বশুরবাড়িতে তাকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়। মেয়েটির নতুন জীবনে প্রবেশ করার সমূহ প্রস্তুতি, আনন্দ এক লহমায় তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। পরিণয়ের মতো মধুর বন্ধন কোথাও যেন দেনা-পাওনার অঙ্কের মাপজোকে তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। একদিকে পাত্রপক্ষের অর্থলোভ ও হৃদয়হীনতার চিত্র অন্যদিকে পরিবারের অসহায়তা, বিড়ম্বনা কন্যাকে ব্যথিত করে তোলে। হৃদয়হীন পাত্রপক্ষের নির্লজ্জ দাবি পূরণ করতে গিয়ে পাত্রীপক্ষের কীরূপ শোচনীয় পরিণতি হয়, নিম্নলিখিত প্রবাদ দুটিতে সেই দৃষ্টান্ত প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

১. "কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে।
বরের বাপ বসে আছে, পাঁচশো টাকার আশে।
২. কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে।"[৩]

সমাজে অধিক বয়সেও পুরুষের বিবাহ করার রীতি প্রচলিত ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের মূল্য সচরাচর দেওয়া হত না। এ প্রসঙ্গে একটি মেয়েলি ছড়ার উল্লেখ করা যায়—

"তালগাছ কাটুম রসিক বাটুম্ গৌরী এল ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কী।"[৪]

উক্ত ছড়াটি মেয়েদের জীবনে নিয়তির করুণ পরিহাসেরই ইঙ্গিত বহন করে। সেইসঙ্গে পুরুষের বহুবিবাহ যে সমাজিক নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, নিম্মলিখিত প্রবাদগুলি তার সাক্ষ্য দেয়—

১. "এককালে ঠেকেছে তিন কাল গিয়ে।
তবু আবার করবে বিয়ে।
২. পচা মরিচের দর যেমন, দু'বার বিয়ের দশা তেমন।
৩. ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে।"[৫]

বর্ষীয়ান স্বামী ও সতিনের সাথে সংসারধর্ম করতে গিয়ে নারীদের বিবাহ পরবর্তী জীবন যে অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তা বলাই বাহুল্য। তাদের প্রতিনিয়ত সইতে হয় সতিনের বিড়ম্বনা। স্বামীর প্রতি অধিকারবোধ থেকেই স্বামীর প্রণয়ের অংশীদার সতিনের প্রতি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, তিক্ততা জন্মায় এবং একে অপরের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সতিনের প্রতি বিদ্বেষের কথা টুসু গানেও প্রকট হয়ে উঠেছে—

১. "পিঁয়াজ কেটে রসুন লাগাব, তোদের বাবুগিরি ঘোচাব
আইল সতীন মারবি নাকি, তোর মার খেয়ে ঘর যাব।
পিঁয়াজ কেটে রসুন লাগাব।।"[৬]
২. "ও তুই খাইস্ না বনের শালপাতে,
মরণ আছে সতীনের হাতে।
এক সরপে, দুই সরপে তিন সরপে লোক চলে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

টুসু আমার মধ্যে চলে বিন্ বাতাসে গা দোলে।।”[৬]

এ প্রসঙ্গে সেঁজুতি ব্রতের দুটি ছড়া উল্লেখ করবো—

১. “অশথ তলায় বসত করি।
সতীন কেটে আলতা পরি।।
সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটা।।
অভ্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।।”[৭]
২. “হাতা, হাতা, হাতা!
খা সতিনের মাথা।
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি!
সতিন মাগি টেরি।
পাখি, পাখি, পাখি!
সতিন মাগি মরতে যাচ্ছে
ছাদে উঠে দেখি।
বঁটি বঁটি, বঁটি!
সতিনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।”[৮]

মেয়েলি ব্রতের ছড়াগুলি মূলত নারীমনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমূহের প্রতিচ্ছবি। সেঁজুতি ব্রতের উক্ত ছড়া দুটিতে নারীমনের অসহ যন্ত্রণা, সতিনের প্রতি প্রবল প্রতিহিংসা গোপন থাকে না।

সেকালে বিধবাদের এমনকি যারা শৈশবে অথবা কৈশোরে বিধবা হয়েছে তাদেরও বৈরাগ্য ও কঠোর ত্যাগস্বীকার করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হত। সমাজে বিধবা, প্রধানত বাল্যবিধবাদের অসীম দুরবস্থা ছিল। নিম্নলিখিত প্রবাদগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়—

১. “বিধবার একাদশী করলে আর ভাল কি,
না করলেই নিন্দা।
২. সধবা কপালে সিঁদুর পরে,
বিধবার কপাল চড়চড় করে।”[৯]

এবার আসা যাক অন্য একটি প্রসঙ্গে— কুমারী ও সধবা নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ধ্যানধারণাগুলি মেয়েলি ব্রতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। নারীমনের সহজাত আকাঙ্ক্ষাগুলি, কামনাগুলি যা তারা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারে না, ব্রতের আচার পালনের মধ্য দিয়ে তা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখ করবো—

“এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
ভাদুলি-ঠাকুরানি ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলি তিন কুলে সুখ।”[১০]

সংসার জীবনের যাবতীয় দুঃখ-বেদনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দেবী ভাদুলির কাছে এ যেন স্ত্রীজাতির চিরন্তন প্রার্থনা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিবাহের পর স্বজনদের ছেড়ে নববধূ যখন একটি নতুন পরিবারে পদার্পণ করে তখন সে তার নবপরিবারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে সহানুভূতি, স্নেহ ও ভালোবাসা। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামীর গৃহে পা দিয়েই তাকে সহ্য করতে হয় লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বিদ্রুপ, নির্যাতন। যার মূলে প্রধানত যিনি সক্রিয় থাকেন তিনি হলেন শাশুড়ি। শাশুড়ি যেমন একদিকে কারো মা, তেমনি তিনিই আবার শাশুড়ি। কিন্তু মা হিসেবে তিনি যতখানি উদার, স্নেহবৎসল, শাশুড়ি হিসেবে ঠিক তার উল্টো, বধূর প্রতি তিনি বিরূপ, বধূকে তিনি শাসনে রাখেন, বধূর সামান্যতম ত্রুটিও তার কাছে ক্ষমার অযোগ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মূলত কার্যকরী হয় শাশুড়ির কর্তৃত্বমূলক মনোভাব। তার নিজের হাতে গড়ে তোলা সংসারে অপর একজন নারীর আধিপত্যকে তিনি সহজে মেনে নিতে পারেন না। বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই তিনি নানা কারণে পুত্রবধূকে তাচ্ছিল্য করে মনে মনে অপার সন্তুষ্টি লাভ করেন। নিঃসঙ্গ গৃহবধূকে হতে হয় প্রবল মানসিক নির্যাতনের শিকার। শাশুড়ির নিকট সে শুধুমাত্র একটু স্নেহের আশ্রয় প্রার্থনা করে, একটি ছড়ায় তার পরিচয় মেলে—

"রাগ করো না শাশুড়ি গো, আমি তোমার মেয়ে।
তুমি যদি তাড়াও তবে দাঁড়াই কোথায় যেয়ে।।"[১১]

এ প্রসঙ্গে একটি চটকা গানের উল্লেখ করা যায়—

"আমার শ্বশুর করে খুশুর খুশুর ভাশুর করে গোঁসা।
নিদয় হেন স্বামী আস্যা ধরল চুলের খোঁপা।
আমার শাশুড়ি আছে ননদী আছে আছে ভাইগ্না বউ
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল আউগাইল না কেউ।"[১২]

গানটিতে বধূর প্রতি তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের নিপীড়নের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। গানটি অসহায় গৃহবধূর জীবনযন্ত্রণার এক নিদারুণ অভিব্যক্তি।

হৃদয়হীনা শাশুড়ি পুত্রবধূর প্রতি কিছুটা তত্ত্বাবধানমূলক মনোভাব পোষণ করেন। শাশুড়ির আদেশ বধূর কাছে অবশ্য পালনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কেননা কর্তব্যে গাফিলতির ফল হতে পারে তাচ্ছিল্য, বিদ্রুপ এবং নির্যাতন। সেই কারণেই শ্বশুরগৃহে শাশুড়ি, ননদের উপস্থিতি তাকে পদে পদে আশঙ্কিত করে তোলে। তার চারপাশে শ্বাসরোধকারী আবহের সৃষ্টি হয়। তাই গৃহে শাশুড়ি, ননদের অনুপস্থিতিতে বধূ সাময়িক সময়ের জন্য হলেও স্বস্তির নিশ্বাস নেয় এবং তার মনে স্বাধীনতার আস্বাদ জেগে ওঠে—

"শাউড় নাই ননদ নাই, কারে করমু ডর।
আগে বাড়মু ভিজ্যা ভাত, পাছে মুছমু ঘর।।"[১৩]

শ্বশুরগৃহে বধূর স্নেহবিহীন জীবন কোনোভাবে অতিবাহিত হতে থাকে। যন্ত্রণাদীর্ণ মুহূর্তগুলিতে বিগত জীবনের সুখস্মৃতিগুলি মনে পড়ে যায়। পরিবারের অসীম স্নেহে লালিত কন্যা স্বজনদের সান্নিধ্য লাভে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে ভাইয়ের আগমনে বধূর প্রাণ আনন্দে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে—

" 'ওপারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম্,
ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙ্গা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।।'
'এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে।।'
'হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হলো দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।।"[১৪]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উক্ত ছড়াটিতে ভাইয়ের সাথে কথোপকথনে বোনের বেদনাসিক্ত অন্তরের যন্ত্রণা, বঞ্চনার হাহাকার ব্যক্ত হয়েছে। ছড়াটির মধ্য দিয়ে পল্লীবাংলার গৃহবধূর বিষন্ন ম্লান মুখ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। একটি টুসু গানেও অনুরূপ অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়—

"এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে,
মাগো, আমার মন কেমন করে।
পরের মা কি বেদন জানে অন্তরে জ্বালায়ে মারে।"[১৫]

উৎসবের দিনগুলোতে বালিকাবধূর প্রিয়জনদের মুখগুলো, তাদের প্রত্যেকের সাথে নানান সুখস্মৃতিগুলি বারবার মনে পড়ে যায়। তাদের জন্য তার মন কেমন করে। পৌষ পার্বণের দিনেও তাকে স্নেহহীন পরিবেশে 'পরের ঘরে' দিনযাপন করতে হয়। মনে মনে মায়ের কাছে তনয়ার অনুযোগ এখানে প্রকাশিত।

পিতৃগৃহে গিয়ে বধূ আর শ্বশুরালয়ে ফিরে আসতে চায় না, তার কারণ হল পুনরায় শাশুড়ি কর্তৃক শারিরীক ও মানসিক নিপীড়নের আশঙ্কা —

"ই চালে পুঁই উ চালে পুঁই পুঁইয়ের খাব মেচুরি,
আর যাবনা শ্বশুরবাড়ী ধইরে মারে শাশুড়ি।"[১৬]

উক্ত টুসু গানটি নারী হৃদয়ের দহন জ্বালার অকপট স্বীকারোক্তি।

কন্যার বিবাহ দেবার পর কন্যার পিতা-মাতা সর্বদা এই উৎকণ্ঠায় থাকে নতুন সংসারে গিয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় তনয়া সুখে আছে তো। কন্যা মাতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনকালে মাতা তার সঙ্গে কিছু আহার্য সামগ্রী প্রেরণ করেন শ্বশুরগৃহের লোকেদের প্রসন্ন করতে কারণ তিনি জানেন, তাদের প্রসন্নতার উপরই নির্ভর করে আছে তাদের কন্যার বৈবাহিক জীবনের সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য —

"উড়কি ধানের মুড়কি দিল শাশুড়ী ভুলাতে।"[১৭]

জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রেই গৃহে স্ত্রীকে রেখে স্বামী বিদেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। প্রিয়তমা স্ত্রীর অশ্রুসজল চোখ দুটি বারংবার মনে পড়লেও অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের কাঠোর জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হয়। প্রিয়তমা পত্নী বিচ্ছেদজনিত বেদনায় অধীর হয়ে স্বামী গৃহে শীঘ্রই ফিরে আসবে এই আশায় পথ চেয়ে বসে থাকে। নারী হৃদয়ের সেই বেদনার প্রতিফলন ঘটেছে এই বর্ণনামূলক প্রেমসঙ্গীতে—

"নাথ, আমায় ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।
বৈশাখে বসন্ত জ্বালা, ছেড়ে গেল চিকন কালা,
আমরা নারী হই অবলা
কেমন করে রইব ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।"[১৮]

নারী হৃদয়ের আন্তরিক অভিব্যক্তিই উক্ত বর্ণনামূলক সঙ্গীতটির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এভাবেই পল্লীবাংলার মেয়েরা তাদের জীবনের অযুত সমস্যাগুলি, তাদের জীবনযন্ত্রণা, আবেগ, দীর্ঘশ্বাসগুলি নির্দ্বিধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুনিপুণ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে। তাদের হৃদয়ের অভিব্যক্তিগুলি শাশ্বত আবেদন সৃষ্টি করেছে। আর এর মধ্য দিয়েই নারীর সেই ভদ্র, নম্র, লজ্জাশীল, অনুগত ইমেজটি চূর্ণবিচূর্ণ হতে চায়। তাদের রচিত সাহিত্যে তারা নিজ ব্যক্তিত্বের তেজ ও দীপ্তিতে ভাস্বর, অনেক বেশি দৃঢ় ও নির্ভয়া। যে মেয়েরা পূজার্চনায়, ব্রত পালনে, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে চালের গুড়োর পিটুলি সহযোগে বিচিত্র নকশার আলপনা আঁকতে পারে, বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন রাঁধতে পারে, বিচিত্র ফোঁড়ের সাহায্যে কাঁথায় সুন্দর নকশা কাটতে পারে, সুমিষ্ট গলায় গান গাইতে পারে, তাদের মধ্যে যে সৃজনশীল প্রতিভা থাকবে, তারা যে ব্যক্ত করার কৌশল জানবে, সৃজনী দক্ষতায়

হৃদয়ের অব্যক্ত বঞ্চনাগুলিকে ব্যক্ত করে সেগুলিকে হৃদয়ের গহন থেকে মুক্ত করে দেবে সুনির্মল আকাশে, সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই প্রত্যাশিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কোনঠাসা হতে হতে একসময় অন্তঃপুরের পরিসরে নারীরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, নিজেদের অসম্মানের ভাষা বুঝতে শিখেছে। আর তাই নারীর নিজস্ব স্বর, তাদের জীবনের বঞ্চনাগুলি তারা তুলে ধরেছে লোকসাহিত্যের আয়নাতে। হৃদয়ের খেদগুলোকে প্রকাশ করে তারা লাভ করেছে অপার পরিতৃপ্তি— যা তাদের পরম প্রাপ্তি।

Reference:

১. দৈনিক আজাদী পত্রিকা, বাংলার লোকসাহিত্যে নারী-পুরুষ বৈষম্য— মাধব দীপ, শনিবার, ২৭ জানুয়ারি ২০১৮
২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন ও কৃষ্ণগোপাল রায় (সম্পাদনা), সাহিত্য-প্রবন্ধ : প্রবন্ধ-সাহিত্য, বাংলা প্রবাদ : বাঙালি জীবন, বিপ্লব চক্রবর্তী, কলকাতা-০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, দোলযাত্রা ২০০৯, পৃ. ৩০৯
৩. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ), কলকাতা-৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ৬৫
৪. বিশ্বাস, সুফল, লোকমনন : লোকসাহিত্য, কলকাতা-০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ২০১৪, পৃ. ১৫৯
৫. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ), কলকাতা-৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ৫৬
৬. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ৯৯
৭. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড : আলোচনা), কলকাতা-৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাঃ লিঃ, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ১৯১
৮. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, কলকাতা-১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুণর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, পৃ. ৪৭
৯. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ), কলকাতা-৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ৬১
১০. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, কলকাতা-১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুণর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, পৃ. ৭
১১. মজুমদার, মানস, লোকসাহিত্য-পাঠ, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৫৩
১২. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউজ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ২৮২
১৩. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৯, পৃ. ৩১১
১৪. তদেব, পৃ. ৩১৪
১৫. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ১০৩
১৬. তদেব, পৃ. ১০৬
১৭. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৯, পৃ. ৩১২
১৮. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ৫৪৬